বাঙালি সমাজ ও ....

জ্যোতির্ময় দত্ত

সত্যজিৎ রায়, বাঙালি সমাজ ও (অবশ্যম্ভাবীরূপে) রবীন্দ্রনাথ

সত্যজিৎ রায় যেকোনো দেশ ও কালেই এক বিশেষ ব্যক্তি ব'লে পরিচিত হতেন, কিন্তু আমাদের সময়ে ওদেশে তিনি বিশেষ শুধু নন, তিনি এক বিপুল ব্যতিক্রম। তাঁর তুলনায় আমরা কেবল বেঁটে নই, আমরা ছোটো। আমরা অসল ও তার্কিক ও ভয়ানক রাজনীতিবিশারদ। এই আবহাওয়ায় সত্যজিৎ -এর কর্মক্ষমতা এতোই বিস্ময়কর যে তার কোনো সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যা সম্ভব ব'লে বিশ্বাস হয় না। তিনি যেন স্বেচ্ছাচারী প্রকৃতির এক খামখেয়াল। ছবি,সংগীত, পত্রিকা, রহস্য - গল্প, চলচিচত্র, প্রচ্ছদ তিনি সর্বক্ষণই কিছু না - কিছু করছেন, এবং যখন যা-কিছুই কন, তা বিপুলভাবে উপভোগ করেন। গত দশকে তিনি বছরে ন্যূনপক্ষে একটি করে ছবি করেছেন। গত বছর এমন একটা সময় গেছে যখন কলকাতায় তাঁর দু-দুটো নতুন ছবি এক সংগে দেখানো হচ্ছিল---যা অন্য কোন পরিচালকের ভাগ্যে ঘটেনি! কিন্তু এও যেন যথেষ্ট নয়; সেই সময় 'বাদশাহী আংটি' প্রকাশিত হচ্ছিলো প্রতিমাসে নতুন সংস্করণ, এবং--- যেটা লক্ষ্য ক'রে সুখের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ঈর্ষাও অনুভব করেছি---আমাদের এক প্রতিযোগী তাঁরই রচিত চিত্রনাট্য- পুষ্ট কলেবরে, তাঁরই অংকিত প্রচ্ছদ পরিধান ক'রে, আলোকিত করছিলো পত্রিকার স্টল। সত্য, 'বাদশাহী আংটিকোনো 'পাগলা দাশু' নয়। ঠিক, তাঁর প্রচণ্ড কর্মকাণ্ডে উৎক্ষেপিত বস্তুসমূল যেমন প্রকারে বিচিত্র তেমন গুণেও অত্যন্ত অসম। কিন্তু এসবই তাঁর প্রবল জীবনশক্তির প্রমাণ। বিশ্লেষণের চেয়ে নির্মাণ, সমালোচনার চেয়ে সৃজন, তাঁর পক্ষে অধিক স্বাভাবিক।

তাঁর স্বাস্থ্য, তাঁর 'স্বাভাবিকতা', তাঁর সাধারণ মানবতা তাঁকে তাঁর সমসাময়িক বিদেশী শিল্পীদের থেকেও ভিন্ন করেছে। মনের দিক থেকে তিনি উনিশ শতকের 'বাস্তববাদী' ঔপন্যাসিকের আত্মীয়। তিনি তাঁদের মতোই হৃদয়বান ও সদ্বিবেচক, তঁাদের মতোই এক সামাজিক ও সভ্যভাষায় বিশ্বাসী, তিনি যেন জানেন যে কোনটা বাস্তবিকই সত্য আর কোনটা ব্যক্তিগত দুঃস্বপ্ন। তিনি তাঁর শিল্পকে ভালোবাসেন; চলচিচত্রের ভাষা নিয়ে তিনি মুগ্ধ, এই ভাষা প্রয়োগে তিনি জাদুকর। কিন্তু তাঁর শিল্পের গুণই এই যে তাঁর আধার কখনো নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। তাঁরা ভাষা আশ্চর্য স্বচ্ছ। তিনি এই ভাষার যাবতীয় সুযোগ গ্রহণ করেন কিন্তু নিজেকে তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হ'তে দেন না। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের প্রয়োজনে তাঁর ভাষা কখনো সূক্ষ্ম ও অনুপূঙ্খবহুল, কখনো সামাজিক চিত্রণের জন্য আক্ষরিক, কখনোপ্রকৃতির সঙ্গে একতাল ও গীতিময়, কখনো উদ্ভট ও খামখেয়ালি। 'পথের পাঁচালী' ও 'পরশপাথর', 'অপরাজিত' ও 'অভিযান', 'কাঞ্চনজঙ্ঘা' 'কাপুষ' ইত্যাদির প্রকরণবৈচিত্র, এমন কি বৈপরীত্য, আজ এতাদিন পরে, পুনর্বিবেচনায়, হঠাৎ বিস্ময়কর মনে হচ্ছে। কিন্তু তার চেয়েও যা বিস্ময়কর তা হ'লো ঐ ছবিগুলি দেখারসময় এই বৈচিত্র চোখ ধাঁধাঁনো তো দূরের কথা, প্রায় চোখেই পড়েনি। তার কারণ বিষয়ভেদেই সত্যজিৎ -এর প্রকরণভেদ।

তাঁর স্টাইলের এই মে থেকে মে দোলা কারো কাছে সন্দেহজনক ঠেকে। একদা এঁরাই সত্যজিৎকে অন্য কারণে সন্দেহ করতেন ঃ ইনি সত্যভাষী ও অনুভূতিপ্রবণ বটেই, কিন্তু মহাশয়ের ছবিতে ফিল্মীয় কসরৎ তেমন নেই। এখন, একের পর এক এতো ঢঙের ছবির পর উল্টো কথা শোনা যাচ্ছে ঃ ইনি এতোগুলো ভাষা জানেন, এঁর এতোরকম ঢঙ, এঁর কৌশল ঢের আছে কিন্তু উপলব্ধি কম। এই যে সচছন্দে ভাষা থেকে ভাষান্তরে গমন, এটা প্রমান করে যে তাঁর নিজস্ব কোনো বক্তব্য নেই,

তিনি দোভাষী মাত্র। এঁর কোনো আপন ভাষা নেই ব'লেই ইনি অনুবাদে এতো পটু। এতো বলেও কেউ কেউ সন্তুষ্ট হননি। 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' - এর কায়দা কেরামতি, প্রকরণের খেলা, ক্যামেরার ভোজবাজি, অনেকের চোখ এতোই ধাঁধিয়ে দিয়েছে যে তাঁরা বলেছেন এটা সত্যজিৎ -এর আগের ছবিগুলি থেকে এতোই ভিন্ন যে সন্দেহ হয় এটা তিনি শিল্পের তাগিদে করেন নি, 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' করেছেননিতান্তই ব্যবসায়িক তাগিদে।

অথচ 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' -এর গর্ভ ও প্রসূতি পর্বে উল্টো সন্দেহই প্রকাশ করেছিলো সবাই। এই গল্পনিয়ে সত্যজিৎ দীর্ঘকাল আঁকিবুকি কাটছিলেন, জল্পনা - কল্পনা করছিলেন, নিতান্তই নিজের খেয়ালে, সৃষ্টির আনন্দে। কিন্তু এটিকে চলচিচত্রে রূপায়ণ এতোই অবাস্তব একটি ব্যবসায়িক প্রস্তাব মনে হয়েছে যে প্রথম প্রযোজক প্রস্তুতির মধ্যপথ থেকেই পশচাদপসরণ করেন, এবং দীর্ঘদিন এই ছবির আর্থিক ঝুঁকি নিতে আর কেউ সাহস করেন নি।ছবিটি যখন নির্মীয়মাণ, স্টুডিও মহলে সেই অল্পকালের মধ্যেই 'গু গা বা বা' - অবাস্তবতা, ব্যয়বাহুল্য, বাঙালি দর্শকের চি বিষয়ে অজ্ঞতা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছিলো।

এবং প্রদর্শনের প্রথম দু-দিন সপ্তাহে না-সত্যজিৎ, না - তাঁর প্রযোজক, না - অন্য কেউ ছবিটির বিপুল সাফল্য হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। এটি একটি ক্ল্যাসিক, এটি যে বছরে - বছরে পুষানুত্রমে দেখতে হবে, গুপী ও বাঘা যে বাঙালি শিশু মানসে শেয়াল পণ্ডিত কি বোকা কুমিরের মতোই একটি শাশ্বত স্থান ক'রে নিলো, তা তখন এর নির্মাতারাও ভাবতে পারেন নি। যেমন 'পথের পাঁচালী', যেমন 'চ ালতা', তেমন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' -ও সত্যজিৎ করেছেন নিজের খেয়ালে, আনন্দের জন্যে, ঠিক তাঁর মেজাজের সঙ্গে বিষয়টি খাপ খায় ব'লে। মানুষটা তিনি যেমন, যেমন তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, মনের জগৎ, পরিবারের প্রবণতা, তাতে এই রকমই একটি ছবি করার তাঁর যেপ্রবল লোভ হবে তা অনুমান করা যায়। এর পশচাতে কোনো নীট বাণিজ্যিক অভিসন্ধি অনুসন্ধানের প্রয়োজন নেই। সুকুমার রায়কে যেমন কোনো উচচাসাংস্কৃতিক মঞ্চ থেকে অবতরণ করে লক্ষ্মণের শক্তিশেল কি খাই খাই লিখতেহয়নি, নবপর্যায় সন্দেশ-এর সম্পাদক এবং স্টীল - মানে - হরণ - মানে - সিঙ - মানে গান ইত্যাদি উদ্ভট শব্দমালার রচয়িতা সত্যজিৎকে তেমন 'গুপীগাইন' সৃষ্টিতে স্বভাববিদ্ধ কিছু করতে হয়নি।

।। দুই ।।

কিন্তু বস্তুতই কি সত্যজিৎ -এর অন্য ছবিগুলির ঢঙ থেকে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' এতো ভিন্ন? সত্যজিৎ -এর শ্রেষ্ঠ গুণ হচেছ যে তিনি কোনো বিগত কালের, কিংবা চিরকেলে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে এমন প্রত্যক্ষ ক'রে তোলেন, এমন বিশ্বাস্য ও অনুপুঙ্খে ধনী, ভাবনাকে এমন স্পষ্ট দেহ দিতে পারেন, যে আমরা তাকে প্রায় তথ্যচিত্রের মর্যাদা দিয়ে ফেলি। আসলে, এটা যে কল্পিত, ঐ অঙ্গভঙ্গি কি ঐ চোখের তাকানো যেমন সত্যজিৎ -এর কল্পিত--- চার হাসি কি অমলের গান যেমন রবীন্দ্রনাথ কি সত্যজিৎ -এর কল্পনায় ছাড়া কোথাও ছিলো না কোনো জাদুঘরে তার চিহ্ন নেই, তেমন সেকালের পোশাক, কি সংবাদপত্র, কি রাজনীতির আলোচনা, সবই সত্যজিৎ কল্পনা করেছেন--- নানা তথ্য ও দলিলের সঙ্গে মিলিয়ে, সঙ্গতি রক্ষা ক'রে কল্পনা ক'রেছেন, ঠিকই, কিন্তু উনিশ শতক, কি অপুর গ্রাম চিরকালের জন্য বিলীন হয়েছে এবং সত্যজিৎ -এর ছবিতে যা দেখি তা তাঁর কল্পনার জারকে রূপান্তরিত। অপুর গ্রাম কোনো বাস্তব গ্রাম নয়, তার জীবন কোনো রক্তমাংসের কিশোরের নয়। তেমন কোনো কোনোশিল্পী ব্যবহারিক ও প্রাত্যহিককেও সুদূর কি আজগুবি রূপে উপস্থিত করতে পারেন, সত্যজিৎ রায়ের প্রতিভার কল্পিতকে তথ্যের ঘনতা দানে সক্ষম। গুপী গাইন ও বাঘা বাইনের জগৎ ঘোষিতভাবেই অলীক; কিন্তু সত্যজিৎ -এর স্বাভাবিকতা ও আক্ষরিকতা আমাদের মনে সত্যের প্রত্যয় সৃষ্টি করে। বাঁশবাগানের বাঘ কি মরা নদীর বুকে ওস্তাদজির পাল্কি প্রায় এক ডকুমেন্টারি প্রতীতি আনে। কিন্তু এটা কি সত্যজিৎ -এর চিরকেলে ঢঙ নয়? চার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দূরবীন দিয়ে দেখা ঠিক এরকমই আক্ষরিক। কিংবা দুর্গা ও অপুর প্রথম ট্রেন-দর্শন।

।। তিন ।।

'গুপী গাইন বাঘা বাইন' অনেক অর্থেই একেবারে খাঁটি পরিবারিক ছবি। দর্শকদের পক্ষে তো বটেই; 'গু -গা-বা-বা' তিন

পুষ একত্রে উপভোগ কররার একমাত্র 'ফ্যামিলি পিকচার'। এবং এর নির্মাণে কোনো আদর্শ কুটির শিল্পের মতো পুরো রায় পরিবার নিয়োজিত ছিলেন। পরিচালকের স্ত্রী ও পুত্র ছবিটির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নেরপ্রতি পর্যায়ে কেবল উৎসাহ নয়, কয়েক ক্ষেত্রে পরামর্শও দিয়েছেন। কিন্তু এই দুই অর্থ ছাড়াও, ছবিটিতে ইউ ররায়অ্যাণ্ড সন্স-এর পারিবারিক স্বাক্ষর স্পষ্ট। সত্যজিৎ যখন কেবল ট্রামে যে লোকটার মাথা ছাদে ঠেকে যায় ব'লে পরিচিত ছিলেন, কিংবা যখন কবিতার বই-এর মলাটের জন্য খ্যাত হলেন, তখনও যেমন, তেমন আজও, যখন পৃথিবীর কাছে তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত ভারতীয়দের অন্যতম, তিনি কেবল সত্যজিৎ রায় নন, তিনি উপেন্দ্রকিশোরের পৌত্র সুকুমার রায়ের ছেলে। মানুষটি ও তাঁর বিচিত্র কর্মগুলি নানা পথে ঘুরে ঘুরে যে জাল বুনছিলো---যাতে কৌতূহলী দর্শকের কখনো মনে হয়েছে যে সুকুমার রায়ের পুত্র তবে কি ভোগ্য পণ্যের টুকরো বিজ্ঞাপন এঁকে পবিত্র মানবজন্ম অতিবাহিত করবেন? কখনো মনে হয়েছে এই ঘোড়া সিপাহীর চেয়েও উৎকৃষ্ট!--- সেই সূত্রগুলো হঠাৎ যেন এখানে এসে, 'গুপী গাইন বাঘা বাইনে', গ্রন্থিবদ্ধ হ'লো। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ -এর যে কয়টি গভীর মিল আছে,এই আপতিক পারিবারিক মিল সে তুলনায়ও কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। বাঙালির সামাজিক সাংগঠনিক প্রতিভা বড়ো ক্ষীণ; সব প্রতিষ্ঠান, দল আখড়া, ঝিবিদ্যালয়, পত্রিকা, প্রেস সব কিছুই প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র ক'রে বেঁচে থাকে, এবং তাঁর লোকান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমাদের দীর্ঘদিন কোনো ক্যাভেণ্ডিশ ল্যাবোরেটরি, কোনো কনকর্ড গ্রাম, কোনো সালোঁ কি সর্বন নেই; আমাদের প্রতিযোগিতা ও উৎসাহদান, সমালোচনা ও পরামর্শের কোনো আবর্তময় পরিবেশ নেই। এমতাবস্থায়, যে একমাত্র ঝিবিদ্যালয় ও সালোঁ কোনো প্রতিভাবান শিল্পী পেতে পারেন তা হ'লো আত্মীয়মণ্ডল, কিংবা একমাত্র যাঁর সঙ্গে রেশারেশি করা যায় তিনি হলেন খ্যাতিমান পিতা। সত্যজিৎ খুব অল্প বয়সে তাঁর রক্তমাংসের বাবাকে হারিয়েছিলেন; কিন্তু --- এটা ফ্রয়েডীয় অন্তর্দৃষ্টি ছাড়াও অনুমান করা যায়---হয়তো সেজন্যেই তাঁর জীবন তাঁর পূর্বপুষের দ্বারা এমন অধিকৃত। জ্ঞানোন্মেষ থেকেই গান, ছাপাখানা, ব্লকের অ্যাসিড-এর গন্ধ, কবিতা, উদ্ভট গল্প ইত্যাদি সত্যজিৎ -এর সহচর, এইসব নিয়েই জগৎ। এইগুলি তাঁর ইন্দ্রিয়েৰ সম্পদ। আর তাঁর ব্যক্তিত্বের পেছনে তার হাসি আর বন্ধুতা আর ঢিলেঢালা মেজাজের কেন্দ্রে, এক উদগ্র আকাঙ্খাঃউদ্ভটের জাদুকর সুকুমার রায়ের উপরও টেক্কা দেওয়ার, মৃত পিতাকে নিজেকে খ্যাতির দ্বারা অমরত্বদানের।

এই আকাঙক্ষাগুলি যদিও তাঁর অন্য ছবিতে ও কর্মেও নিহিত ছিলো, গুপী ও বাঘার কীর্তি কাহিনীতে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। এমন কি, টুনটুনির বই-এর টুনটুনি - খেকো রাজা একেবারে তার ডোরাকাটা জামাশুদ্ধ এই ছবিতে ঢুকে পড়েছে। এই ছবি দেখে সমালোচকরা অবাক? এই ছবির মেজাজ তো, বরং, হ্যাব্‌সবর্গ ওষ্ঠের মতো, বংশের তৃতীয় পুষে প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী ছিলো।

।।চার ।।

চলচ্চিত্র - রসিকেরা পরিবারের প্রতি আমার মনোযোগ অপ্রাসঙ্গিক ভাববেন। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য চলচ্চিত্র সমালোচনা নয়, আমার চিন্তার বিষয় বাঙালি সমাজ। আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে আমাদের সামাজিক প্রতিভা বড়ো দুর্বল। আমরা খুব কম প্রতিষ্ঠানই গড়তে পেরেছি; এবং যা-কিছু গড়ি তাও অল্পদিনে; রাজনীতির প্রাদুর্ভাবে,বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত হয়। এমন কি রাজনৈতিক দল পর্যন্ত এই মানসিক মাটিতে বাড়তে পারে না; বৃক্ষরূপ দলের চেয়ে লতাও গুল্মরূপ গোষ্ঠীই বেশি। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কি জমিদারি, দাতব্য হাসপাতাল কি গ্রন্থাগার, প্রত্যেকেরই জীবনশক্তি বড়ো ক্ষীণ, প্রতিষ্ঠার সঙ্গে - সঙ্গে প্রায় এগুলির অবনতি শু হয়। এর মধ্যে উনিশ শতকের দ্বিতীয় - কি - তৃতীয়-পুষ পর্যন্ত ঊর্ধবারোহী পরিবার কয়টি পরম বিস্ময় ও কৌতূহলের বিষয়। প্রতিভা স্বভাবতই দৈব, এবং সমাজেরযে-কোনো স্তরে, যে-কোনো কোণায়, এর আবির্ভাব ঘটতে পারে। কিন্তু আবির্ভাব এক জিনিশ, বিকাশ সম্পূর্ণ আরেক ব্যাপার। পৃথিবীর চতুর্দিকে ইতস্তত তেজস্ক্রিয় পদার্থ ছড়ানো; কিন্তু সেগুলি এতো ক্ষীণ ও বিক্ষিপ্ত ভাবে আছে ব'লেই তারা রশ্মি বিকিরণ করতে করতে নিঃশেষিত হ'যে যাচ্ছে, কোনো বিশাল, বিধবংসী বিস্ফোরণ, কি শান্ত ধীর সৃষ্টিশীল বিস্ফোরণমালায় পরিণত হচ্ছে না। অনেকখানি তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্বল্প পরিধির মধ্যে একত্র করলে তবেই আণবিক বিস্ফোরণমালার সূচনা হয়। ঠিক তেমনই, কোনো নির্বোধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গুণ ও প্রতিভা যেমন নিষ্ফলভাবে বিকিরণ করতে - করতে ফুরিয়ে যায়, অনন্ত শূন্যে হারিয়ে যায়, আবার অন্য কোনো সংবেদনশীল, প্রতিক্রিয়াময় পরিবেশে যে কেবলি বুদ্ধিমান সেও গুণী এবং যে গুণী সে প্রতিভাবান হ'য়ে উঠতে পারে। বাংলাদেশের এই বন্ধ্যা মভূমির মধ্যে শ্রীহট্ট কি নবদ্বীপে কখনো - কখনো এই রকম পরিবেশ গ'ড়ে উঠেছিল। এবং

ইদানীংকালে এই রকম পরিবেশের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার। ঐ পরিবার তার স্বগন্ডির মধ্যে যেন এক স্বয়ংসম্পূর্ণ জগৎ দার্শনিক ও ধর্মনেতা, সংস্কৃতজ্ঞ ও সঙ্গীতজ্ঞ, ভাষাবিদ ও অনুবাদক পরস্পরের সন্নিধ্যে বিকাশ লাভ করতে পেরেছিলেন। মানুষ একা এই পৃথিবীর দুর্বলতম প্রাণীদের মধ্যে একটি; পরস্পরের স্কন্ধে ভর ক'র যুগ - যুগ ধ'রে জ্ঞ ান ও স্মৃতির সঞ্চয়ে, সে এই সভ্যতার বিপুল পিরামিড নির্মাণ করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এরকম একটিপিরামিড -এর শীর্ষস্বরূপ। তুলনায় অনুচচ হলেও সত্যজিৎ রায়ও তাঁর গুণবান পূর্বসূরিদের উপর দন্ডায়মান একটি শৃঙ্গ।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সত্যজিৎ -এর তুলনা অবশ্যম্ভাবী। দুজনেরই চরিত্রে অন্ধকারের চেয়ে আলোক, অধীরতার চেয়ে তৃপ্তি, সংশয়ের চেয়ে ঋাস বেশি। দুজনের শিল্পই সহৃদয় সপ্রেম। দুজনের ভাষাই স্বচ্ছন্দ ও বেগবান; তাসাংকেতিক কি তির্যক নয়। আত্মার যে যন্ত্রণা, জড়ত্বের যে পেষণ, কখনো - কখনো শিল্পীকে ভাষাহীন ক'রে দেয়, তা যেন এঁদের অপরিচিত। এঁরা সর্বদা সৃষ্টিশীল; একের পর এক পরীক্ষা ক'রে চলেছেন। কিন্তু এই পরীক্ষা প্রধানত আধারও মাধ্যমের, তাঁর শিল্পের কেবল বহির্ভাগ এর দ্বারা স্পৃষ্ট। যে মুহূর্ত থেকে সত্যজিৎ তাঁর প্রকাশের পথ চিনেনিয়েছেন, সে মূহূর্ত থেকে তাঁর কর্ম বির ামহীন। রবীন্দ্রনাথের যখন বয়স তিরিশ তখনই তিনি এতো লিখেছেন, এতা বিচিত্র বিষয়ে ও বিভাগে, যে কোন ইতিহ াসচেতন পাঠকের এই বোধ হ'তে বাধ্য যে বাংলা সাহিত্যের আদি থেকেএযাবৎ যা - কিছু হয়েছে তার মধ্যে রবীন্দ্রবাবু হলেন প্রধান ঘটনা। এবং যদিও এরকম একটি কুসংস্কার বাংলার বাইরে প্রচলিত যে নোবেল পুরস্কার তাঁর স্বদেশীয় প্রতিষ্ঠ াকেও দৃঢ় করেছিলো, তাঁর দেশবাসী তাঁর প্রতিভার বৈদেশিক স্বীকৃতির অপেক্ষা রাখেনি। বাঙালি লেখকগণ যতোই ঈর্ষা ও দ্বেষপরায়ণ হোন না - কেন, তাঁরা পঞ্চাশ বর্ষীয় রবীন্দ্রনাথকে সভা ডেকে, প্রদীপ জ্বালিয়ে ও মাল্যদান ক'রে, তাঁকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব'লে সংবর্ধনা জানিয়েছেন। সত্যজিৎ -এর পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তির আর এক বছর আছে, এবং এর মধ্যে বহু সভা - সমিতির আয়োজন হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু বাঙালি দর্শক ইতিমধ্যেই তাঁকে বারংবার, পণ্ডিতদের সব প্রতিকূল সংশয় সত্বেও সংবর্ধিত করেছে। সত্যজিৎ-এর ছবির ভক্ত পৃথিবীর সর্বত্র, কিন্তু তিনি পৃথিবীরসেই মুষ্টিমেয় সৃজনশীল পরিচালকগণের একজন, যাঁর শিল্পের দৃঢ় আর্থিক ভিত্তি তাঁর স্বদেশেই।

।। পাঁচ ।।

কিন্তু এগুলি বাহ্য লক্ষণমাত্র; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর একটি গভীর মিল আছে -- যে মিল প্রথম দৃষ্টিতে বরং ভিন্নতা ব'লে বোধ হয়। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথকে কখনোই কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের বাজারে - প্রতিযোগিতায় নামতে হয়নি। তাঁর অন্য সব কিছুর চাইতেই নাটক বড়ো পারিবারিক। জোড়াসাঁকোর ক্ষুদ্র ও স্বয়ংস্তর বিশ্বের মধ্যেই তিনিতাঁর মঞ্চের অভিনেতা থেকে শু ক'রে দর্শক সবই পেয়েছিলেন। পেশাদার মঞ্চের মান ছিলো নিচু, দর্শকগণ শিল্পেঅনভিজ্ঞ ও চিহীন। রবীন্দ্রনাথের ন াটকে আর সেকালের পেশাদার মঞ্চে অভিনীত নাটকের জাত আলাদা। তাঁর নাটকের সূক্ষ্মতা ও প্রতীক - নির্ভরতা, তাঁর নাটকের উৎকণ্ঠার অভাব ও তত্ত্বের অতিশয়তা, তাঁর মৃদু ও অনুত্তাল গানও নৃত্য---এসবই বৃহৎ দর্শকসমাজের অনুপযুত্ত। যদি এই মঞ্চের উপর তাঁকে নির্ভর করতে হ'তো, তবে ত্রমান্বয়ে এই ধরণের নাটক লেখা এমনকি রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও সম্ভব হতো না। কলকাতার মঞ্চকে পরিবর্তিত কি সংস্কারেরপ্রচেষ্টা নিয়ে নিজের ইচছানুরূপ নাট্যপরিবেশ সৃষ্টি করলেন।

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কেবল নাটকরচনাতেই এই বৃহৎ ভারতীয় সমাজের স্থানুত্বের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হননি। ভারতীয় সমাজ বড়ো বিশাল ও অনড়, বড়ো নিরানন্দ, বিধিনিষেধে অর্ধমৃত, যে - কোনো প্রাণবান ও অনুভূতিপ্রবণ চিত্তের কাছে ভয়াবহ। রবীন্দ্রনাথ এই বিশাল মভূমির মধ্যে শান্তিনিকেতনে আনন্দ ও প্রাণের ক্ষুদ্র একটি দ্বীপ রচনা করার চেষ্টা করেছিলেন; ভ ারতীয় সমাজের বিশালতায় ও জড়ত্বে পীড়িত হ'য়ে আগেও যেমন মরমী মানুষ ক্ষুদ্র - ক্ষুদ্র আশ্রয় কি গুপ্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কেবল প্রতিভা ছিলো না, ছিলো অর্থবল, তাঁর পশচাতে ছিলো ঠাকুর-সাত্র াজ্যের সমগ্র শত্তি। সেহেতু তিনি কেবল নাটক রচনাতেই নয়, এমন কি জীবন প্রণালীতেও বাঙালি সমাজ থেকে কিঞ্চিৎ স্ব াধীন হ'তে পেরেছিলেন।

সত্যজিৎ-এর পশচাদ্‌ভূমিতে কোনো শান্তিনিকেতন নেই। আপাত দৃষ্টিতে তিনি বাংলা ছবির বাজারে শত প্রতিযোগীর মধ্যে একজন। এবং এই প্রতিযোগিতায় তিনি জয়ী। কিন্তু টালিগঞ্জের সঙ্গে যাঁর ক্ষীণতম পরিচয়ও আছে তিনিই জানেন সত্যজিৎ ঐ মহলে কতো বড়ো ব্যতিত্রম, তাঁর চতুর্দিকে কী বিশাল শূন্যতা। সত্যজিৎকে তাঁর সহকর্মীরা ভত্তি করেন, কেউ

কেউ প্রায় দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন, কিন্তু তাঁর প্রতিভা তো দূরের কথা, তাঁর শিক্ষার কিচির কণামাত্রও তাদের নেই। অবশ্য এটা কেবল তাঁর সহকর্মীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়; তাঁর না - আছে উপযুক্ত সমালোচক, না - আছে প্রস্তুত দর্শক। ‘পথের পাঁচালী’, কি ‘চালতা’, কি ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ --- যেগুলি তাঁর আর্থিকভাবে সবচেয়ে সফল ছবি, সেগুলি প্রত্যেকটিই একেকটি ট্যুর দ্য ফোর্স, তাঁর দর্শকদের চিত্ত তিনি চলচ্চিত্রের অতিরিক্ত নানা গুণ দিয়ে জয় করেছেন। এই পরিবেশ - এর দুর্বলতা তাঁকে সম্পূর্ণ বিকশিত হ’তে দিচ্ছে না; তাঁর পক্ষে যে - ধরনের মুক্ত ও শিক্ষিত সমালোচনা ও সফল প্রতিযোগিতা প্রয়োজন, তার অভাবে ছবির পর ছবিতে অসাবধানতা, চিন্তার শৈথিল্য ও প্রেরণার এবং উদ্ভাবনার অভাব থেকে যায়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমসাময়িক নাগরিক জীবন নিয়ে প্রহসন লিখেছেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রধান নাটকগুলির স্থান-কাল অনির্দিষ্ট এবং চরিত্রগুলি প্রতীক। কলকাতার মধ্যবিত্ত, সাধারণ, অকাব্যিক জগৎ থেকে তিনি নানাভাবে স’রে গিয়েছিলেন। আম াদের জীবনযাত্রার মালিন্য ও দীনতা তাঁকে পীড়িত করেছিলো, সেহেতু তিনি আসবাব, গৃহসজ্জা, খাদ্য পরিবেশন, পোশ াক থেকে শু ক’রে উৎসব, নারী-পুষের মেলামেশা, শিক্ষাপ্রণালী সবই নিজের ইচ্ছেমতো উদ্ভাবন করেছিলেন। তিনি তাঁর কালের বাস্তব কলকাতা কিংবা মধ্যবিত্ত বাবুটিকে বিশেষ ভালোবাসতে পারেননি; তাই তিনি এমন এক কল্পনার ভারতবর্ষ সৃষ্টি ক’রে নিয়েছিলেন যা উপনিষদের তপোবনের কিংবা কালিদাসের রাজসভার। এই কল্পনা সুন্দর। কিন্তু মানতেই হয় এতে কেবল নিষ্ঠার নয়, রক্ত- মাংসেরও অভাব আছে।

তাঁর নাটকে এই রক্তাল্পতা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। কিন্তু তাঁর অন্যান্য সৃষ্টির মধ্যেও অভিজ্ঞতার কিঞ্চিৎঅভাব আছে। তঁ ার জীবন বড়ো বেশি অন্দরমহলে কেটেছে; তাঁর ব্যক্তিত্ব বড়ো বেশি পরিবার - আশ্রয়ী। শুধু রবীন্দ্রনাথেরই নয়। উচচবর্ণ বাঙালি সমাজে পরিবারপ্রথা এমনই যে মানুষের পক্ষে তার ত্রোড় ছেড়ে স্বাধীন ও অনাশ্রিত ব্যক্তি হ’য়ে ওঠা কঠিন। শিশুকাল থেকে আমরা অতিরিক্ত স্নেহে ও সেবায় লালিত; পরিবার ও আত্মীয়মণ্ডল প্রত্যেকটি আঘাতকে মৃদু ও মসৃণ ক’রে দেয়; আমরা জীবনকে রক্তে ও স্বেদ ও সংশয়েৰ মধ্যে দিয়ে আবিষ্কার করতে বাধ্য হই না। পাশ্চাত্য ব্যক্তির তুলনায় মধ্যবিত্ত বাঙালি কতো সংযত ও ভদ্র, কতো বেশির সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়েনেয়, সংঘাত এড়াবার আশায় কতো জোড় াতালি দিতে সে প্রস্তুত! এবং আমাদের সাহিত্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের তুলনায় অনেক বেশি শোভন ও বানানো। আমরা সংঘাতের চেয়ে সমন্বয়কে এবং উপস্থিতের চেয়ে আদর্শকে ভালোবাসি।

এবং এই প্রবণতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ উনিশ শতকের বৃহৎ ও গুণবান বাঙালি পরিবারগুলি। বাইরের জগৎ হয়তো নিষ্ঠুর ও নিয়মহীন; সেখানে হয়তো কোনো ঋিপিতার স্নেহ ও শাসন নেই। কিন্তু এই পরিবারগুলির মধ্যে ছিলো শৃঙ্খলা ও প্রেম, ন্য ায়বিচার ও আত্মত্যাগ বাইরে যখন অন্যায় ও অপমান ও কুশ্রীতা সব কিছুকে প্লাবিত করেছে, স্বপ্নবিলাসী বাঙালী তার অ াত্মীয় - পরিজন নিয়ে একটুখানি সৌন্দর্য, একটু শিল্প, একটু কল্পনার মোহময় মণ্ডল রচনা করেছে।

কোনো কোনো গুণ ও ক্ষমতার --- যেমন সংগীতপ্রতিভার - বিকাশের পক্ষে এই পরিবেশ হয়তো অনুকূ ল। কিন্তু জগতের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের পক্ষে বোধ হয় নয়।

।। ছয় ।।

উপরের মন্তব্যগুলি সত্যজিৎ - বিষয়ে প্রযোজ্য কিনা তা ত্রমশ বোঝা যাবে। তাঁর নির্মীয়মাণ ছবিটির নায়ক নাকি একজন সমাজচ্যুত যুবক এবং পরিবেশ হচ্ছে আজকের কলকাতা। যদি সত্যজিৎ এই যুবককে স্বেদ ও শোণিতদান করতে পারেন, আমরা সবাই আনন্দিত হবো। স্পষ্টতই তিনি এই কাল ও সমাজকে তাঁর শিল্পের প্রদেশভুক্তকরতে বদ্ধপরিকর। এমন ইচছ া প্রবীণ রবীন্দ্রনাথকেও অধিকার করেছিলো, এবং তা থেকেই ‘শেষের কবিতা’। কতোটা বাস্তব তা নিয়ে সংশয় থাকতে প ারে, কিন্তু বাংলা গদ্যের, বাংলা ভাষার এটি একটি বিস্ময়। সত্যজিৎ রায়ও তাঁর ভাষার জাদুকর। তিনি আধুনিক বাঙা লি যুবকের ছবি করতে গিয়ে হয়তো ছবির ভাষাকে নায়কের স্থানে অভিষিক্ত করবেন। যাই কন, কোনো প্রতিকৃতি, কোনো মুখের রেখাচিত্র ফুটে উঠুক আর -না উঠুক, তা চলচ্চিত্রভাষারসীমা অন্তত নির্দেশ করবে।

কলকাতা, ১৯৭০

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com